ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 762-771
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.066

বাস্তুআধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’

শেখ ইমরান পারভেজ, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, গভঃ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ecospirituality is the concept of understanding the interconnectedness of all living organisms on Earth and acknowledging their mutual dependence, while valuing their importance in maintaining ecological equilibrium. From the writings of thinkers like Thomas Berry, Dennis Edwards, etc., we can derive some principles of ecospirituality such as human-nature relationship, sanctity of nature, nature's mystery, nature's benevolence, man's sincere respect for nature's creations and its supervision, etc. Bibhutibhushan Bandyopadhyay is one of the greatest writers in modern Bengali literature. Bengali novel ‘Aranyak’ is considered as one of his best literary works. Here In this article, through literary analysis the present researcher has tried to explore this novel in the context of ecospirituality.

Keywords: Ecospirituality, principles, Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Aranyak, literary analysis.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘আরণ্যক’ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিভূতিভূষণ তাঁর বিহারের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাসটি রচনা করেন। কোলকাতার পাথুরিয়াঘাটার বাবু খেলাতচন্দ্র ঘোষের ভাগলপুর এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার হিসাবে তিনি সেখানে যান এবং সেখানে থাকাকালীন ‘আরণ্যক’ লেখার পরিকল্পনা করেন।

‘আরণ্যক’ উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৩৭-৩৯ খ্রিষ্টাব্দ। ভাগলপুর অঞ্চলের ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দুর্গম অরণ্যে বসবাসকারী গাঙ্গোতা জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন, দোষাদ, ছত্রী, চাষা-কলোয়ার, মৈথিল ব্রাহ্মণ, বাঙালি, রাজপুত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিচিত্র মানুষের জীবনকথা উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সত্যচরণ; তাঁর বন্ধু অবিনাশ ছিল ময়মনসিংহের কোনও এক জমিদারের ছেলে। বিহারের পূর্ণিয়া এলাকায় অবিনাশদের জমিদারি দেখভালের জন্য তাঁর এই অঞ্চলে আগমন। সত্যচরণ তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কলকাতায় কাটিয়েছেন; বন্ধুবান্ধব, বই পড়া, থিয়েটারে যাওয়া, সিনেমা দেখা বা গান শোনা এসবই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিকে তিনি ‘জঙ্গল-মহাল’এ

থাকতে পছন্দ করেননি এবং ফিরে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর চেনা নগরবাসে। আক্ষেপ করেছেন- '...চাকুরির কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। ...কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে, আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল।'[১] তবে সময়ের সাথে সাথে অরণ্যের সুর তাঁকে ধীরে ধীরে আবিষ্ট করতে থাকে এবং এই যাপিত জীবনটাই তাঁর চেতনার অংশ হয়ে ওঠে; কলকাতায় ফেরার মানসিক চাহিদা ফিকে হতে শুরু করে- 'দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর-ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না- আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।'[২] তিনি এখানে কিছুদিন থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু আদিগন্ত আকাশ এবং একা থাকার সৌন্দর্য তাঁকে সেখানে টেনে রাখে চুম্বকের মতো। ক্রমে তিনি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে জঙ্গল, বুনো তামারিস্ক, উন্মুক্ত আকাশ, জমির গন্ধ, এখানকার মানুষজন এবং সর্বোপরি শহরের কৃত্রিম জীবন থেকে মুক্তির নেশায়।

বাস্তুআধ্যাত্মিকতা হল একধরনের বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যেকার আধ্যাত্মিক আন্তঃসংযুক্ততার উপর জোর দেয়। এই বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রকৃতিকে পবিত্র বা ঐশ্বরিক হিসাবে দেখার প্রবণতা। বাস্তুআধ্যাত্মিকতার অস্তিত্ব বিভিন্ন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ বা অ-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটেও পাওয়া যেতে পারে যেখানে প্রকৃতিকেই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে মানা হয়। বর্তমান আলোচনায় বাস্তুআধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের আরণ্যককে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

মানব-প্রকৃতি সংযোগ: মানুষ এবং প্রকৃতির ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার বিষয়টি আরণ্যক-এ তুলে ধরা হয়েছে, যা মূলত বাস্তুআধ্যাত্মিকতারই প্রতিফলন। সত্যচরণ জমি জরিপের কাজ করার সময় দেখতে পান কেমন করে সেখানকার মানুষ প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। পুরুষ এবং মহিলারা অরণ্য থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু পান; গনু মাহাতো, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, যুগলপ্রসাদ, ধাওতাল সাহু, রাজা দোবরু পান্না এবং অন্যান্য চরিত্ররা যেন জঙ্গলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। গনু মাহাতো সত্যচরণকে জানান-"ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, লুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে- লতানে গাছ, ছোট ছোট কাঁকুড়ের মত ফল হয়; সে সময় এক মাস এ অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়।"[৩] উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আসে এক সাধুর কথা, যিনি সত্যকে জানান- "পরমাত্মা আহার জুটিয়ে দেন। বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে এক রকম কন্দ হয় তা ভারি মিষ্টি, লাল আলুর মত খেতে, তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ-জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। আমলকী খুব খাই, রোজ আমলকী খেলে মানুষ হঠাৎ বুড়ো হয় না, যৌবন ধরে রাখা যায় বহু দিন।"[৪] ব্যতিক্রমী নন্দলাল ওঝা, রাসবিহারী সিংদের মতো মানুষকেও আমরা দেখতে পাই, যারা নিজেদের মুনাফার জন্য মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়েরই ক্ষতি করতে পিছুপা হয়না। উপন্যাস এগোনোর সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই মুখ্যচরিত্র সত্যচরণ তাঁর সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বিশুদ্ধ রূপে প্রকৃতির প্রবল প্রেমিকে পরিণত হয়েছে। চাঁদনি রাতে বনভ্রমণ তাঁর ভালো লাগে। "সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনো দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা! এমন উন্মুক্ত আকাশতলে ছায়াহীন উদাস গভীর

জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না- ক'জন দেখিয়াছে?"[৫] জ্যোৎস্না যেন চন্দ্রাহত করে ফেলে তাঁকে, জ্যোৎস্নার প্রতি ভালোবাসা সত্যচরণকে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নেয়। নাঢ়া বইহারের জমি জরিপ, জমির বিলি বন্দোবস্ত করার জন্য সত্যকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হতো। সত্য জানাচ্ছেন এক খর রৌদ্র দুপুরে কাছারি ফেরার পথে ক্লান্ত হয়ে "...একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত-দুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি একপ্রকার বনলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে-একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের কাছে দুলিতেছে।"[৬] এখানে ক্লান্ত পথিককে অরণ্য কেবল আশ্রয়ই দেয়নি, যেন মিশিয়ে নিয়েছে তার নিজের অস্তিত্বের সাথে। এখানে "প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।"[৭]

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্তে সরস্বতী হ্রদের বনভূমিকে সাজিয়ে তুলতে সত্যচরণ কলকাতা থেকে বিদেশী ফুলের বীজ এবং ডুয়ার্সের পাহাড় থেকে বন্য জুঁইয়ের লতা আনিয়ে রোপণ করেন। এই বনভূমিতে বিচিত্র পাখিদের সমাগম নৈসর্গিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। সত্যর ভাষ্যে- "এত পাখীও আছে এখানকার বনে!...অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছি, আমার চারিপাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায়-লতায় বসিয়া কিচ কিচ করিতেছে- আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও নাই।"[৮] অরণ্যে মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণ পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অরণ্য অঞ্চল তাঁকে এমনই নিবিড় বন্ধনে যুক্ত করে যে জঙ্গল-মহালে তাঁর কাজ সমাপ্তির পর কলকাতা ফেরার পূর্বে মানসিক কষ্ট ও অনুতাপের বিষয়টি ফিরে ফিরে আসে।

প্রকৃতি সচেতনতা এবং তত্ত্বাবধান: প্রকৃতি সচেতনতা এবং তত্ত্বাবধানকে বাস্তুআধ্যাত্মিকতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সত্যচরণের কাজ ছিল জঙ্গল-মহালের এর বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘা জমির দেখভাল করা, সেখানে প্রজা বসিয়ে জমিদারি খাজনার জোগান মজবুত করা। অর্থাৎ বকলমে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল জঙ্গল নিধনের উদ্দেশ্যে। সত্যচরণ নিজেও বিষয়টি বুঝেছিলেন। একাজ তাঁকে করতে হলেও তাঁর সংবেদনশীল মন এর বিপ্রতীপ ছিল। '...মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া বইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল।...হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।"[৯] জঙ্গলের বুকে তুলনামূলক নেতিবাচক শক্তি যেমন নন্দলাল বা রাসবিহারীর মতো মানুষদের কার্যকলাপও তাঁর পছন্দ হয়নি বলেই বোঝা যায়।

উপন্যাসে দেখতে পাই আর এক চরিত্র বয়োজ্যেষ্ঠ রাজু পাঁড়েকে। সত্যচরণ তাঁকে চাষ আবাদের জন্য জঙ্গল-মহালের এর দুই বিঘা জমি দেন। কিন্তু তাঁর ঈশ্বর আরাধনা এবং প্রকৃতি তন্ময়তায় অনেকটা সময় ব্যয় হয়। ফলত দেড় বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাজু জঙ্গল পরিষ্কার করে ফসল ফলানোর উপযুক্ত করে তুলতে পারেন না। সত্যচরণের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন- '...এখানে দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন - কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।"[১০] যদিও সত্যচরণ তাঁকে বৈষয়িক হওয়ার পরামর্শ দেন, তবে তিনি রাজুর উপর

ঠিক বিরক্ত হতে পারেন না; বরং মানুষটিকে তাঁর ভালোই লাগে। রাজুর কাছে তিনি মাঝে মাঝে যান। তাঁর জন্য আরও কিছু জমির বন্দোবস্ত করেন।

আর এক চরিত্র বনোয়ারীলালের আত্মীয় যুগলপ্রসাদ। এই মানুষটির জীবনে অভাব অনটন রয়েছে, সাংসারিক দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা রয়েছে; তবুও এসব কিছু পুষ্পপ্রেমী মানুষটির ভবঘুরেপনাকে রুখতে পারেনি। সত্যচরণ তাঁর জন্য আজমাবাদ কাছারিতে মুহুরীর চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। যুগল তাঁর স্বভাবের কারণে আত্মীয় বনোয়ারীলালের কাছেও কিছুটা ব্রাত্য, অথচ সেই ভবঘুরে প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষটিই সত্যচরণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাঁর সম্পর্কে সত্যর বিশ্লেষণ-"... নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরিব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।"[১১] সত্য তাঁকে সাথে নিয়ে বনভূমিকে সাজিয়ে তোলার কথা ভাবতে থাকেন- " আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সংকল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব,..।"[১২]

সত্যচরণের সাক্ষাৎ হয়েছে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর সাথে। দরিদ্র রাজার আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেছেন। সত্যকে রাজা দেখিয়েছেন নিজের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান- পাহাড়ের উপর দিকে এক প্রাকৃতিক গুহা। পাহাড়ের মাথায় বটগাছতলায় রয়েছে রাজা দোবরুর বংশের সমাধিস্থান। এই বৃদ্ধ রাজা যেন একাধারে তাঁর প্রাচীন রাজবংশ এবং প্রাচীন অরণ্যের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা দোবরুর কথায় উঠে এসেছে এই জঙ্গলের বন্য মহিষদের রক্ষাকর্তা দেবতা টাঁড়বারোর আখ্যান- "...টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন- কত লোক দেখেছে।"[১৩]

নিতান্ত চাকরির কারণেই সত্যকে জঙ্গল-মহালের বেশির ভাগ জমি প্রজাবিলি করে দিতে হয়। তবুও সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের বনভূমিটা অন্তত এই বিলি বন্দোবস্তের বাইরে রাখার চেষ্টা করেন। আক্ষেপ ঝরে পড়ে সত্যচরণের-"তবে কতদিন আর রাখিতে পারিব? সদর আপিস হইতে মাঝে মাঝে চিঠি আসিতেছে, সরস্বতী কুণ্ডীর জমি আমি কেন বিলি করিতে বিলম্ব করিতেছি? নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়া এখনও পর্যন্ত রাখিয়াছি বটে, কিন্তু বেশি দিন পারিব না।...এই জন্মান্ধ মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল জানি না- শুধু তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আজও সরস্বতী হ্রদের তীরবর্তী বনানী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।"[১৪]

প্রকৃতির কোলে আঞ্চলিক উৎসব: ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেকোনো যেকোনো মনুষ্যসমাজে উৎসবের এক আলাদা গুরুত্ব থাকে। আরণ্যকের বিভিন্ন গোষ্ঠীজীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। সে কাছারির পুণ্যাহ উৎসবই হোক কিংবা গ্রামের হোলির মেলা বা রাজা দোবরু পান্নার গ্রামের ঝুলন উৎসব, অরণ্যকেন্দ্রিক এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনপদে বিভিন্ন সময়ে এসেছে উৎসবের প্রসঙ্গ। উপন্যাসে প্রথম যে উৎসবটির প্রসঙ্গ আমরা পাই, সেটি আষাঢ় মাসে কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। সত্যর ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়। গনোরী তেওয়ারী দূর-দূরান্তের বস্তির লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে আসেন। "পুণ্যাহের পূর্বদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিয়াছিল, পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে দুপুর

হইতে না হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌঁছিতে লাগিল, এমন মুস্কিল যে, তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না।"[১৫] এই প্রবল বর্ষণের মধ্যে অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করে পুণ্যাহ উৎসব শেষ হল।

এরপর শীত শেষে বসন্তে আসে হোলির প্রসঙ্গ। সদর কাছারি থেকে চোদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে এক গ্রাম্য মেলায় সত্যচরণ উপস্থিত হন। "...ছোট্ট একটা গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে চারিদিকে শাল-পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে। মহিষারডি, কড়ারী-তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারূপ প্রভৃতি দূরের নিকটের নানাস্থান হইতে লোকজন, প্রধানত মেয়েরা আসিয়াছে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়াল ফুল কি রাঙা ধাতুপ-ফুল গুজিয়া; কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকানো,...।"[১৬]

অকৃত্রিম প্রকৃতির বুকে এই মেলায় ঘুরতে আসা নারীদেরকে বসন্তের রাঙা বনভূমি নিজের মরসুমি উপকরণে সাজিয়ে তুলেছে। "মেলার স্থান হইতে কিছুদূরে একটা শালবনের ছায়ায় অনেক লোক রাঁধিয়া খাইতেছে- ইহাদের জন্য মেলার এক অংশে তারিতরকারীর বাজার বসিয়াছে, কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় শুঁটকি কুচো চিংড়ী ও নালসে পিঁপড়ের ডিম বিক্রয় হইতেছে। লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য। তা ছাড়া আছে কাঁচা পেপে, শুকনো কুল, কেঁদ-ফল, পেয়ারা ও বুনো শিম।"[১৭] খাদ্যের জোগান দিয়ে মেলায় আসা দরিদ্র মানুষগুলোর পেটের খিদে মেটাচ্ছে এখানকার প্রকৃতিই।

ফসল কাটা হয়ে গেলে ফুলকিয়া বইহারে একটা অস্থায়ী মেলা বসে। " সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল।... এসময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।"[১৮] প্রকৃতির সহায়তায়, মেলাকেন্দ্রিক মানুষজনের অস্থায়ী বাসস্থানও গড়ে উঠেছে এই জঙ্গল এলাকায়। "কত নূতন খুপরি, কাশের লম্বা চালাঘর চারিদিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল। শুকনো কাশের ডাঁটার খোলা পাকাইয়া এদেশে একরকম ভারি শক্ত রশি তৈরি করে,...।"[১৯]

শ্রাবণ মাসে রাজা দোবরু পান্না সত্যচরণকে ঝুলন উৎসবের নিমন্ত্রণ করেন। রাজার বংশে বহুদিন ধরে এই উৎসবটি চলে আসছে। নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজা দোবরুর রাজধানী চকমকিটোলায় পৌঁছালে সেখানে পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘরে অতিথিদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়। সত্যর কথায়- "গভীর রাত্রে চতুর্দশীর জ্যোৎস্না বনের বড় বড় গাছপালার আড়ালে উঠিয়া যখন সেই বন্য গ্রামের গৃহস্থবাড়ির প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারের জাল বুনিয়াছে, তখন শুনিলাম রাজবাড়িতে বহু নারীকণ্ঠের সম্মিলিত এক অদ্ভুত ধরনের গান। কাল ঝুলন-পূর্ণিমা, রাজবাড়িতে নবাগত কুটুম্বিনী ও রাজকন্যার সহচরীগণ কল্যকার নাচগানের মহলা দিতেছে। সারারাত ধরিয়া তাহাদের গান ও মাদল বাজনা থামিল না।"[২০] পরদিন ঝুলন উৎসবে সন্ধ্যের আগে সত্যচরণ তাঁর সাথীদের নিয়ে একদল তরুণ তরুণীকে অনুসরণ করে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেন। সত্যর বর্ণনায়, সেখানে "আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল- পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা। কত রাত পর্যন্ত সমানভাবে নাচ ও গান চলিল-মাঝে মাঝে দলটি একটু বিশ্রাম

করিয়া লয়, আবার আরম্ভ করে- মাদলের বোল, জ্যোৎস্না, বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমি, সুঠাম শ্যামা নৃত্যপরায়ণা তরুণীর দল- সব মিলিয়া কোনো বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত তা সুশ্রী- একটি মধুর সঙ্গীতের মত তার আকুল আবেদন।"[২১] অপূর্ব এই অনুষ্ঠান উপভোগ করে অনেক রাতের দিকে সত্যচরণ ও তাঁর সঙ্গীরা পাহাড় থেকে নেমে আসেন। প্রকৃতির কোলে এইসব উৎসবের বর্ণনা মরমী পাঠকের চেতনা ছুঁয়ে যায়। প্রকৃতি এবং উৎসব যে একই সুতোয় বাঁধা- পাঠকের মধ্যে সেই উপলব্ধিবোধ তৈরি হয়।

অরণ্যের অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী: স্থানীয় মানুষজনের কাছে এই অরণ্য কেবলমাত্র গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির সমাহার নয়; অরণ্য বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত রহস্যের আধারও বটে। বোমাইবুরুর জঙ্গলে জরিপ চলছিল। সেকারণে আমীন রামচন্দ্র সিং এবং পেয়াদা আশরফি টিণ্ডেল সেখানে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ছোটো দুটো কুঁড়েঘরে কিছুদিন ধরে থাকছিলেন। সেখানে এক রহস্যময় জীব গভীর রাতে আমীনের ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করে। আমীন দেখেন সেটি একটি সাদা কুকুর আর আশরফির চোখে সে এক নারী। রামচন্দ্র সিংয়ের অসুস্থতার খবর শোনার পর সত্যচরণ সেখানে উপস্থিত হলে আশরফি টিণ্ডেল সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলেন। আশরফির বিশ্বাস সেই রহস্যময় জীব আর কেউ বরং নির্জন জঙ্গলের একধরণের জীনপরী 'ডামবাণু' যারা মানুষকে মেরে ফেলে। এর কিছুদিন পর রামচন্দ্র সিং প্রায় উন্মাদ হতে শুরু করেন, ডাক্তার দেখিয়েও কোনো উন্নতি হয়না; শেষ পর্যন্ত তাঁর দাদা তাঁকে নিয়ে চলে যান। এই বোমাইবুরুর জঙ্গলে পরবর্তী সময়ে একই রকম রহস্যময় ঘটনার সম্মুখীন হন মহিষ চরাতে আসা এক বৃদ্ধ এবং তাঁর যুবক পুত্র। তবে এক্ষেত্রে পরিণতি আরও মর্মান্তিক হয়। যুবকটি শেষপর্যন্ত মারা যান।

সত্যচরণের প্রিয় সরস্বতী কুণ্ডীকে কেন্দ্র করেও উঠে এসেছে রহস্য কাহিনি। আমীন রঘুবর প্রসাদ সত্যকে জানান- "হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে; জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐসব পাথরের ওপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে- পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল।..."[২২]

গনু মাহাতো, রাজা দোবরু পান্না, এবং দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালা কথায় ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে উঠে এসেছে বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর প্রসঙ্গ। তবে এক্ষেত্রে সত্যচরণকে দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালা শুনিয়েছেন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা- "...এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্তের ধারে, গর্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থম্কে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।"[২৩] গনু মাহাতোর কাছে সত্য শুনেছেন উড়ুক্কু সাপ, জীবন্ত পাথর, আঁতুড় ছেলের হাঁটা সহ আরও অদ্ভুত সব কাহিনি।

বোমাইবুরুর জঙ্গলের ঘটনা, সরস্বতী কুণ্ডীর রহস্য কাহিনি, কিংবা দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালার দেবতা টাঁড়বারো দর্শনের গল্প একদিকে পাঠককে আছন্ন করে রাখে। অন্যদিকে তেমনই অরণ্যের বুকে সৃষ্ট, মানুষের ইহজাগতিক বোধের অতীত এইসমস্ত কাহিনি বাস্তুআধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে অনেকাংশে মজবুত করে।

প্রকৃতির পবিত্র বিশুদ্ধ সত্তা: উপন্যাসে বিভিন্ন সময়ে ঘুরেফিরে এসেছে জঙ্গল-মহালের বিস্তীর্ণ ফাঁকা প্রান্তর ও বনভূমিতে নিশুতি রাতের শোভা এবং জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ। সত্যচরণের ভাষায়- "দিকচক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর মানুষজন, পাখীর ডাক, বন্য ফুলশোভা- সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই।"[২৪] দোল-পূর্ণিমার রাতে সত্য প্রথমবার ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্না চাক্ষুষ করেন- "ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যলোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না- করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগ্দিগন্ত-বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।"[২৫] বিস্তীর্ণ প্রায়-উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে সেই জ্যোৎস্নার কোনো ছায়া নেই। সেই জ্যোৎস্নালোকিত ফুলকিয়া বইহারকে অজানা পরীরাজ্য বলে মনে হয়, মানুষ যেন সেখানে অনধিকার প্রবেশকারী মাত্র। এক বসন্তে গ্রাম্য হোলির মেলা থেকে কাছারি ফেরার জন্য সকলের বারণ উপেক্ষা করে, পথের বিপদের ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করে ঘোড়ায় চেপে পড়ন্ত বেলায় সত্যচরণ রওনা দেন কেবলমাত্র জ্যোৎস্নারাতে বন পাহাড়ের রূপসুধা পানের বাসনায়। উপভোগ করেন সেই একাকী যাত্রা- "জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাদের কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোন কালেই।"[২৬] আর একবার তাঁকে জমিদারি মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজে পূর্ণিয়া যেতে হয়। সেখানে কাজ মিটে যাওয়ার পরেও ফেরার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে দেরিতে যাত্রা শুরু করেন সেই জ্যোৎস্নায় রাত্রিভ্রমণ উপভোগের উদ্দেশে। "...চাঁদ একটু দেরিতে উঠিলেও ভোর পর্যন্ত জ্যোৎস্না পাওয়া গেল। আর কী সে জ্যোৎস্না! কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না বনে-পাহাড়ে যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ, অথচ এক আশ্চর্য রূপে অপরিচিত স্বপ্নজগতের রচনা করিয়াছে- সেই খাটো খাটো কাশ-জঙ্গল, সেই পাহাড়ের সানুদেশে পীতবর্ণ গোলগোলি ফুল, সেই উঁচু-নিচু পথ- সব মিলিয়ে যেন কোন্ বহুদূরের নক্ষত্রলোক- মৃত্যুর পরে অজানা কোন্ অদৃশ্য লোকে অশরীরী হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি- ভগবান বুদ্ধের সেই নির্বাণলোকে, যেখানে চন্দ্রের উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও নাই।"[২৭] রাসপূর্ণিমার দিন তিনি লবটুলিয়া কাছারি থেকে একা ঘোড়ায় চড়ে জ্যোৎস্নালোকিত সরস্বতী কুণ্ডীর শোভা দেখতে আসেন। সত্যর উপলব্ধি- "...সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে।....পরিপূর্ণ, ছায়াহীন, জলের উপর পড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব

দেবলোকের জ্যোৎস্না...ভোমরা লতার সাদা-ফুলে-ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে...।"[২৮] অন্য এক রাতে নাঢ়া বইহারের জঙ্গল দিয়ে একা কাছারি ফেরার সময় মনে হয়- "যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত।"[২৯]

এখানে পূর্বেই উল্লেখিত গ্রাম্য হোলির মেলার যাওয়ার সময় খর দুপুর তার এক অনন্য রূপে সত্যর নিকট প্রতিভাত হয়- "...অপরাহ্ণের ছায়া নাই, রাত্রির জ্যোৎস্নালোক নাই- কিন্তু সেই নিস্তব্ধ খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে বাঁ-দিকে বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, দক্ষিণে লৌহপ্রস্তর ও পাইয়োরাইট ছড়ানো উঁচু-নীচু জমিতে শুধুই শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ ও রাঙা ধাতুপফুলের জঙ্গল। সেই জায়গাটা সত্যিই একেবারে অদ্ভুত; অমন রুক্ষ অথচ সুন্দর, পুষ্পাকীর্ণ অথচ উদ্দাম ও অতিমাত্রায় বন্য ভূমিশ্রী দেখিই নাই কখনও জীবনে। আর তার উপর ঠিক দুপুরের খাঁ-খাঁ রৌদ্র। মাথার উপরের আকাশ কি ঘন নীল! আকাশে কোথাও একটা পাখী নাই, শূন্য- মাটিতে বন্য-প্রকৃতির বুকে কোথাও একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই- নিঃশব্দ, ভয়ানক নিরালা।"[৩০] এই খর রৌদ্রের সৌন্দর্য দেখে ভাববিহ্বল সত্যর মনে হয়েছে দেশের মধ্যে এমন জায়গা থাকা কল্পনাতীত। সত্য দেখেছেন সামান্য জংলী কাঁটার ফুল কেমন বসন্তের শোভা বৃদ্ধি করেছে। অরণ্যের বসন্ত দেখে মনে হয়েছে- "কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেশ তার, অথচ কি বিরাট!"[৩১]

উপন্যাসে এসেছে মহালিখারূপের পাহাড়ের কথা। সেখানে বনের মধ্যে ঝরণার শব্দ সেই পাহাড় ঘেরা বনানীর নির্জনতাকেই বৃদ্ধি করেছে। যুগের পর যুগ ধরে এই বন পাহাড় একই রূপে রয়েছে। সত্যচরণের কথায়- "মহালিখারূপের পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের সমতলভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় প্রাচীন যুগের মহাসমুদ্র একসময়ে এই বালুকাময় উচ্চ তটভূমির গায়ে আছড়াইয়া পড়িত, গুহাবাসী মানব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিদ্রিত এবং মহালিখারূপের পাহাড় তখন সেই সুপ্রাচীন মহাসাগরের বালুকাময় বেলাভূমি।"[৩২]

সন্ধ্যায় এই উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সত্যচরণের বারংবার মনে হতো অরণ্যের এইসব মানুষ পশুপাখি উদ্ভিদ জলাশয় পাহাড় ইত্যাদি কোনো এক দেবতার কল্পনার মহৎ প্রকাশ। "সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই- এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ।"[৩৩] এইভাবেই সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রকৃতির পবিত্র বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সত্তাটি ফুটে উঠেছে।

উপসংহার: অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তাবিদ এমারসন বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতিতে নিজেকে নিমজ্জিত করার মাধ্যমে মানুষ মহাবিশ্ব এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। এমারসন সমস্ত অস্তিত্বের আন্তঃসম্পর্কের উপর জোর দিয়েছিলেন; যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিমানুষ একটি বৃহত্তর সত্তার অংশ। বিংশ শতকের চিন্তাবিদ থমাস বেরীর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং লেখায় উঠে এসেছে মানুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ। তবে তাঁরও পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন লেখায় এই বাস্তুআধ্যাত্মিকতাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। বাস্তুআধ্যাত্মিকতার নির্দিষ্ট কতগুলো বাঁধাধরা নীতি আছে এমন নয়, প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতাকে উপলব্ধিই এর মূল উপজীব্য। তারপরেও থমাস বেরী, ডেনিস এডওয়ার্ডস্ প্রমুখের লেখা

থেকে মানুষ- প্রকৃতি সম্পর্ক, প্রকৃতির পবিত্রতা, প্রকৃতির রহস্য, প্রকৃতির দানক্ষমতা, প্রকৃতির সৃষ্টিসমূহের প্রতি মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং তার তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কিছু বিষয়কে বাস্তুআধ্যাত্মিকতার নীতি হিসেবে ধরে নিতে পারি। সেই আঙ্গিকেই সমগ্র উপন্যাসের পাঠ বিশ্লেষণের চেষ্টা এই নিবন্ধে করা হয়েছে। সবশেষে বলা যেতে পারে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'আরণ্যক'এ বাস্তুআধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটটি বেশ স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮।
২। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৯।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৫।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৬।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৭১।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৭০।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৭১।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫।
১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৮।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪২।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ২৯।
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০।
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০।
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৯২।
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৯২।
২০। তদেব, পৃষ্ঠা ১২৩।

২১। তদেব, পৃষ্ঠা ১২৪।
২২। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪।
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৮৭।
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫।
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১৭।
২৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৩।
২৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭।
২৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩।
২৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১১২।
৩০। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯।
৩১। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮।
৩২। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৭।
৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪০।

সহায়কপঞ্জি:

১। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প*, কলকাতাঃ বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯।
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক*, কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *উপন্যাসসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতাঃ কামিনী প্রকাশালয়, ২৫ জানুয়ারি, ২০১১।
৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*, কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
৫। Berry, Thomas. *Evening Thoughts: Reflecting on Earth as Sacred Community*. Edited by Mary Evelyn Tucker, Sierra Club Books, 2006.
৬। Brooks Atkinson, editor. *The Complete Essays and Other Writings of Ralph Waldo Emerson*. The Modern Library, New York. 1950.
৭। De Souza, Marian, et al., editors. *International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing*. Springer Netherlands, 2009. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9018-9
৮। Edwards, Denis. *Ecology at the Heart of Faith*. Edwards, Orbis Books, 2011. https://library.oapen.org/bitstream/id/9a60ff19-1c51-48ca-ad73 3ff0fc2327bd/external_content.pdf